কিন্তু মেঘের আকৃতির মতো মতেরও যদি ক্ষণে-ক্ষণে পরিবর্তন ঘটে, তাহ'লে যাকে সমালোচনা-শিল্প বলছি তার মূল্য কোথায়? অর্থহীন কথা দিয়ে ছন্দ সাজালে যেমন কবিতা হয় না, তেমনি সমালোচনা-রচনার রূপটাও তো নির্বস্তুক নয়, তার আন্তরিক বস্তুতেই তার রূপের মূল্য। যদি স্বীকার ক'রে নেয়া যায় যে কোনো মতই কখনো সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হ'তে পারে না, তাহ'লে সমালোচনার মর্যাদা অনেকটা ক'মে যায় না কি? কিন্তু ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, যুগের বৈশিষ্ট্য, অসংখ্য বিচিত্র মতামতের সংঘর্ষ, রুচির অশ্রান্ত জঙ্গমতা— এই সমস্ত অতিক্রম ক'রে মানুষের সৌন্দর্যবোধ, মানুষের আনন্দচেতনায় কিছু-একটা চিরন্তন নিশ্চয়ই আছে, নয়তো সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা কিছুই সম্ভব হ'তো না, থাকতো শুধু খবর, থাকতো শুধু তত্ত্ব। যে-খবর একবার শুনলে আমরা আর ভুলতে পারি না, বার-বার শুনতে চাই, এবং বার-বার শুনেও যা পুরোনো হয় না, তাকেই বলি সাহিত্য, বলি আর্ট। যে-শক্তিতে খবর হ'য়ে ওঠে গান, অনুকৃতি হ'য়ে ওঠে ছবি, সেই শক্তি বিকীর্ণ হয় যে-উৎস থেকে, সে তো স্থানকালের প্রভাবের অতীত, উপকরণের পরিবর্তনে তার কি এসে যায়। সে-শক্তি আনন্দেরই শক্তি। মানুষের আনন্দচেতনায় একটি আদিম অকলুষের নির্বিকারতা আছে ব'লেই তার শিল্পকলা ও সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে একটি সুগভীর ঐক্য ধরা পড়ে, একটি নিরবচ্ছিন্ন ছন্দ। তা-ই যদি না হবে, যদি সমস্ত বিরোধ ও বৈচিত্র্যের অন্তরালে একটি বিশ্বব্যাপী নিত্যতা না থাকবে, তাহ'লে পুরাকালের বাল্মীকি কেন আনন্দ দেয় আমাদের, বিদেশী ফাউস্ট কেন আমাদের কাছে জীবন্ত, চীনে কবিতার কয়েক লাইন অনুবাদ কেন আমাদের মনকে মন্থন করে।

'পথে ও পথের প্রান্তে'র ৪৬ নম্বর চিঠিতে বর্তমান কালের বাংলা দেশে বঙ্কিমের খ্যাতির অবক্ষয় উল্লেখ ক'রে রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যা উত্থাপন করেছেন। 'ভালোমন্দ লাগার আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ শক্তির দ্বারা মানুষের ইতিহাসে যে মানস সৃষ্টির উদ্যম চলেছে, সে মায়ার সৃষ্টি। ... কালে কালে আমাদের মনের দৃষ্টির বদল চলচেই, আজ সেই দৃষ্টির যে-সব উপকরণের যোগে একটা বিশেষ অনুভূতি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েছে, এবং এত স্পষ্ট হয়েছে ব'লেই এত নিত্যরূপে সে প্রতীত, কাল তাদের আগাগোড়া বদল হয় না বটে কিন্তু অনেকখানি এদিক ওদিক হয়ে যায়, তখন বোঝা যায় না বিষবৃক্ষকে এত বেশি ভালো লেগেছিল কী ক'রে। একেই বলা হয় মায়া। এই মায়ার উপর দাঁড়িয়ে কত গালমন্দ তর্কবিতর্ক রক্তপাত। অথচ মানুষের মনের প্রকৃতিতে মোটামুটি অনেকখানি নিত্যতার বন্ধন যে নেই তা বলতে পারিনে, না থাকলে মানবসমাজ হ'তো প্রকাণ্ড একটা পাগলা গারদ।' এই 'নিত্যতার বন্ধনে'ই সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। কখনো-কখনো মানবসমাজকে পাগলা গারদ ব'লে মনে হ'তে পারে না নয়, কিন্তু আরো তলিয়ে দেখলে ধরা পড়ে যে আমরা শুধু

যে যার কুঠরিতে ব'সে চীৎকার ক'রে পরস্পরের কণ্ঠস্বর ডোবাচ্ছি না; শুধু ভেদ নয়, তর্ক নয়, শুধু পরিবর্তনের বিক্ষেপ নয়, মানুষের মনে মিলনের এমন একটি ক্ষেত্র আছে যা কখনো-কখনো ঝাপসা হ'য়ে এলেও কখনোই লুপ্ত হয় না। সেই ক্ষেত্রেই সমালোচনা নিজেকে প্রয়োগ করে, তার পটভূমিকা চিরন্তন, তাই সে সার্থক ও শ্রদ্ধেয়।

তাছাড়া, সমালোচনার কাছে শেষ কথা যদি কখনো আশা করি তাহ'লেই আমরা ভুল করবো। সাহিত্য বা শিল্পকলা এমন বিষয়, যা নিয়ে শেষ কথা কেউ কখনো বলতে পারেনি, বলতে পারে না। কতগুলি সুনির্দিষ্ট নীতির প্রবর্তনা ক'রে সমালোচনাকে একটি সুবিন্যস্ত বিজ্ঞানের সীমার মধ্যে টেনে আনবার চেষ্টা হয়েছে বার-বার, বার-বার সে-চেষ্টা ব্যর্থ করেছে নবীন জীবন্ত সাহিত্যের অভাবনীয়তা। যাকে exact science বলে সমালোচনার প্রকৃতি ঠিক তার বিপরীত, এখানে সবই আপেক্ষিক, সবই আনুমানিক, সবই মোটামুটির কথা। কবিতা কী, এ-প্রশ্নের উত্তর এক কথায় হয় না— কিন্তু অনেকগুলি উত্তর পাশাপাশি সাজালে হয়তো সবগুলিতেই সত্যের আভাস পাওয়া যাবে। সত্যের আভাস এখানে যথেষ্ট ব'লে দুটি বিপরীত কথা একই সঙ্গে সত্য ব'লে গ্রহণ করতে আমাদের বাধে না, বিজ্ঞানের জগতে যা অসম্ভব। যাঁদের রচনায় সত্যের আভাস বার-বার পাওয়া যায় এবং উজ্জ্বলভাবে পাওয়া যায়, সমালোচক হিশেবে তাঁরাই আমাদের নমস্য। তাঁদের মতামতের দেহ কালের দংশনে জীর্ণ হ'তে পারে, কিন্তু তার ভিতর দিয়ে সত্যদৃষ্টির যে-আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে তা ম্লান হয় না।

এই বইয়ে আমার সমকালীন কয়েকজন বাঙালি কবির রচনা নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনাগুলিতে আমার উৎসাহ, আমার অনুরাগ, আমার শ্রদ্ধাই প্রকাশ পেয়েছে। আমার প্রথম যৌবনের নিকুঞ্জে, আমার পরিণত যৌবনের প্রান্তরে নব-নব যে-সব কবি আনন্দের আন্দোলন তুলেছিলেন, এখানে রইলো তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার নিবেদন। ভালোবাসার মতো সুন্দর আর-কিছুই নয়, আর ভালোবাসা জানাতে যত ভালো লাগে, তত ভালো আর-কিছুই লাগে না। অনেকে বলেন, সমালোচককে নিরপেক্ষ হ'তে হবে; এমন কথাও শুনেছি যে সমালোচনায় কিছু নিন্দার অংশ অপরিহার্য। এ-সব কথা আমি বুঝতে পারি না। অনুরাগই তো সেই আগুন, যাতে মনের শিখায় আলো জ্বলে— আর অনুরাগের মতো পক্ষপাতী আর কী; নিন্দাই যে নিরপেক্ষ তা তো নয়, সেটা বিপরীত-পক্ষপাত মাত্র, অথচ আশ্চর্য এই যে বাংলা দেশে নিন্দা করলে সাধুতার জন্য বাহবা পাওয়া যায়। দেখেছো! কেমন ঠিক কথা বলছে লোকটা! যেন মন্দ কথাই সব সময়েই সত্য, আর ভালো কথা অভ্রান্তরূপে ভ্রান্ত। সমালোচনা বলতে আমি বুঝি উন্মীলন; সাহিত্যের বড়ো একটা পটভূমিকায় আলোচ্যকে আলোকিত ক'রে, এবং নিজের উৎসুক চিত্তকে প্রকাশ

ক'রে, পাঠকের উদাসীন মনকে জাগ্রত করেন সমালোচক। এ-কাজে উত্তাপ চাই, উৎসাহ চাই, নিন্দার ঠাণ্ডা সংকীর্ণতা দিয়ে তা সাধিত হ'তে পারে না।

সমালোচনাকে যাঁরা বিজ্ঞানের ক্লাসে ভরতি করাতে চান তাঁরা বলবেন যে যুক্তির তবু একটা স্থিরতা আছে, কিন্তু ভালোবাসা তো একটা আবেগ, আর আবেগ একটা কম্পন, একটা তরঙ্গ, স্বভাবতই ভঙ্গুর ও চঞ্চল, তার উপর মুহূর্তের জন্যও কি নির্ভর করা যায়। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়— এই প্রবন্ধগুলিতে যা লিখেছি আমিই যে আমার বার্ধক্যে তার সব কথা সমর্থন করতে পারবো তারই বা নিশ্চয়তা কী। ভাবীকালের কথা যদি ভাবি, আমার অনেক কথাই পরবর্তী কালে সমসাময়িক মোহাচ্ছন্নতার উদাহরণ-স্বরূপ উদ্ধৃত হ'তে পারে, সে-সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবু এও বলি যে সেটাকে যদি মাত্র সম্ভাবনা ব'লে না-জানতুম— তার বেশি না— তাহ'লে প্রবন্ধগুলি লিখতেই পারতুম না। আমি যা লিখেছি আমার কাছে তা সত্য, এবং অন্যের মনেও সেটা সত্য ব'লে প্রতিভাত হোক, এই ইচ্ছার প্রেরণা না-থাকলে লেখাই বা কেন। আমার কথা লোকে গ্রহণ করবে না, আমি নিজেই হয়তো কোনোকালে অস্বীকার করবো, এ-কথা মনে করা মানে নিজেই নিজের মৃত্যুকামনা করা— সেটা প্রাণধর্মের বিরোধী; আর সে-কথাই যে সত্য তাও তো নয়। মানুষের জীবনে ভিন্ন-ভিন্ন বয়সে ভিন্ন-ভিন্ন ভঙ্গি প্রবর্তিত হয়, কিন্তু মূল সুর একই থাকে, 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত একই রবীন্দ্রনাথকে চেনা যায়। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে মনের উপাদানগুলির পরিমাণ-সংস্থানের পরিবর্তন হয়, কিন্তু উপাদানগুলি মৌল, তারা যা তারা তা-ই— সোনা কখনো রুপো হয় না, শিষে হয় না রুপো। সত্তর বছরের রবীন্দ্রনাথ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটাকে নির্মলনলিনী দেবীর নামে চালাতে পারলে দুঃখিত হতেন না, কিন্তু চালাবার উপায় তাঁর কোথায়, ওরই মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ছিলো 'মানসী', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', 'বলাকা'। ভাষা আয়ত্ত করতে সময় লাগে, আর ভাষা যখন পর্যন্ত ভালো ক'রে আয়ত্ত হয়নি সে-অবস্থার রচনা লেখক পরবর্তী জীবনে যদি বর্জন করতে চান, সেজন্য তাঁকে দোষ দেয়াও যায় না, কিন্তু তার মানে এ নয় যে সে-সব কাঁচা লেখায় তাঁর সেই মনই প্রতিফলিত হয়নি, যে-মন থেকে তাঁর পরিণত রচনাবলি উৎসারিত হয়েছে। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের রচনাশক্তি বাড়ে, কিন্তু প্রাণনশক্তি বাড়ে না, চিন্তা বেশী সুশৃঙ্খল হয়, কিন্তু চিন্তার চরিত্র বদলায় না। পরবর্তী জীবনে আমার এই রচনাগুলিতে এখানে এক লাইন বাদ দিয়ে ওখানে এক লাইন বসাতে ইচ্ছা হ'তে পারে, কিন্তু মূল বক্তব্যকেই বর্জন করতে চাইবো সেটা সম্ভব মনে হয় না। আর ভাবীকাল? সন্নিকট ভাবীকাল যদি প্রত্যাখ্যান করে, দূরের ভাবীকালে আবার হয়তো ফিরে আসবে। সাহিত্যের ইতিহাসে এ-রকম ঘটনা বিরল নয়।

২

আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে যে-প্রবন্ধগুলি লিখেছিলাম, সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে গিয়ে আজ ঈষৎ সংকোচ বোধ করছি। সংকোচ এইজন্য যে আধুনিক কথাটার সংজ্ঞার্থ যুগে-যুগে বদলায়, অভিনবত্বের আকর্ষণ ক্ষণস্থায়ী, এবং সর্বশেষ বিচারে বোধ হয় এ-কথাই বলতে হয় যে সেইটেই সত্যিকার আধুনিক, যেটা চিরন্তন। সেই চিরন্তনকে চিনবো কেমন ক'রে, এটাই সমালোচনার চরম প্রশ্ন, যে-প্রশ্নের উত্তর নেই। হাত বাড়ালেই অতীতের সাহিত্যমঞ্চ থেকে চিরন্তনের উদাহরণ পাকা ফলের মতো টুপ ক'রে পড়তে পারে, কিন্তু সমকালীন সাহিত্যের অবান্তরতা-ভারাক্রান্ত নিষাদ-নিনাদের ভিতর থেকে চিরন্তনের সূক্ষ্ম সুরটি প্রত্যেক বারই একেবারে নির্ভুলভাবে নির্ণয় করতে পারেন, এমন আর্ষ শ্রুতিশক্তি কোনো মানুষের কি হওয়া সম্ভব? কালের এক নিশ্বাসে কোনো-একটা জিনিশ অত্যন্ত স্ফীত ও উজ্জ্বল হয়ে আমাদের চোখের সামনে জেগে ওঠে, আর-এক নিশ্বাসে কিছু-না হ'য়ে মিলিয়ে যায়— তখনই, শুধু তখনই, আমরা বুঝতে পারি যে ওটা বর্ণিল বুদ্বুদ মাত্র— আর এটি দুই নিশ্বাসপাতের মাঝখানে কেটে যায় মানবজীবনের এক যুগ। আবার কত জ্যোতিষ্ক চলতিকালের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হ'য়ে ভাবীকালের অপেক্ষা করে। আমাদের সাহিত্যরচনা, আমাদের সাহিত্যবিচারের প্রচেষ্টা নিয়ে কাল যে-বিচিত্র নৃত্যের আয়োজন করে, তার মতো নিশ্চিত, তার মতো অনিশ্চিত আর-কিছু নয়। সে-কথা ভেবেই এ-বইয়ের আমি নাম দিয়েছি 'কালের পুতুল'। এই প্রবন্ধগুলির প্রথম রচনাকাল আর গ্রন্থাকারে তাদের প্রকাশের মধ্যে ব্যবধান মাত্রই পাঁচ-দশ বছরের, অথচ এরই মধ্যে সেই খেলার একটুখানি আভাস যেন দেখা যাচ্ছে, যে-খেলা নিরন্তর খেলছে জীবনপুতুলি নিয়ে কালের অদৃশ্য হাত। সে-সময়ে বাংলা কবিতায় নতুন আশা এসেছিলো, নতুন উদ্দীপনা: বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী— পর-পর নূতন কবিদের অভ্যুদয়ে আমরা চকিত হয়েছিলাম। নতুন সুর এনেছিলেন তাঁরা, নতুন ছন্দ নতুন ভাষা। আশা আমাদের আকাশ স্পর্শ করেছিলো। আজ যখন বিস্ময়ের সেই রোমাঞ্চন কেটে গেছে, অভিনবত্বের দৌবারিককে পার হ'য়ে যখন রসের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছি, আজ জিজ্ঞাসা করার সময় এসেছে— সে-আশা কি পূর্ণ হয়েছে আমাদের? সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়— এই দু-জনের মধ্যে কোনোদিকেই কোনো মিল নেই— কিন্তু সম্প্রতি এই একটি শোকাবহ সাদৃশ্য ধরা পড়ছে যে দু-জনেই কবিতা লেখা বন্ধ করেছেন। তবু সুধীন্দ্রনাথের তিনখানা কবিতার বই আমাদের সাহিত্যে স্থায়ী হবে, কিন্তু ঐ এক টুকরো 'পদাতিক' হাতে ক'রে সুভাষ কি মহাকালের